GE-2, & DSC-2

পঞ্চম অধ্যায়

দিল্লি সুলতানির অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন এবং সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তার

খলজি বংশের (১২৯০-১৩২০) রাজত্বকালে সংক্ষিপ্ত পরিসরে দিল্লি সুলতানির শাসনতান্ত্রিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। রাষ্ট্র ও রাজনীতির প্রকৃতি সম্পর্কেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জন্ম হয়েছিল।

খলজি বংশের প্রতিষ্ঠার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হল শাসকশ্রেণির সামাজিক পরিধির বিস্তার। উপজাতীয় মামেলুক বা দাস আধিকারিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ইলাবারি তুর্কিগণ গুরুত্বপূর্ণ পদে উচ্চবংশীয় তুর্কিদের নিয়োগের বিষয়ে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইলতুতমিসের রাজত্বকালে তাজিকরা অভিজাত হিসেবে ক্ষমতা লাভ করলেও তাঁর মৃত্যুর পর এরা বিতাড়িত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে ইয়াকুত নামে আবিসিনিয়ান, রাইহান নামে ভারতীয় মুসলমান ও খলজিদের উপস্থিতিকে ব্যতিক্রম হিসেবে তুলে ধরা যায়। বারানি বলেছেন যে ইলাবারি তুর্কিদের থেকে ক্ষমতা খলজিদের হাতে হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে প্রায় আশি বছর যাবৎ তুর্কিদের অধিনস্থ দিল্লিবাসী সার্বভৌমত্ব লাভ করেছিল এবং 'তুর্কিদের সিংহাসন খলজি বংশ অধিকার করেছিল বলে তারা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল।'

(ক) রাষ্ট্রের প্রতি জালালুদ্দিন ও আলাউদ্দিন খলজির দৃষ্টিভঙ্গি

খলজি বংশের ক্ষমতায়ণ ঘটলে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা জালালুদ্দিন খলজি (১২৯০-৯৬) সংকীর্ণ একাধিপত্যতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে বিভিন্ন মানুষকে ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রদান করে উচ্চপদে নিয়োগ করেছিলেন। বলবনের আমলের তুর্কি সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ ও আধিকারিকদের সুলতান গুরুত্বপূর্ণ পদ ও ইকতা প্রদান করেছিলেন। এমনকি বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র মালিক ছাজ্জু কিসলী খানকে কারার মতো উন্নত ও উর্বর অঞ্চলের শাসক পদে নিয়োগ করেছিলেন। মালিক ছাজ্জু দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে অভিযান করলেও তিনি পরাস্ত হন। এ সত্ত্বেও তাকে কোনো গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে হয়নি। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জালালুদ্দিন এক নব্য প্রকৃতির রাষ্ট্র গঠনে মনোনিবেশ

করেছিলেন। এই ধরনের রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য ছিল জনকল্যাণমূলক কার্যের মাধ্যমে বৃহৎ-সংখ্যক জনগণের সমর্থন লাভ করা। বলবনের মতো জালালুদ্দিন আত্ম-অহংকার ও স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে সার্বভৌমত্ব লাভে অগ্রসর হয়নি। বারানি লিখেছেন যে সুলতান 'একটি পিঁপড়েরও অনিষ্ট করতেন না।'

নিজে ধর্মপ্রাণ মুসলমান হলেও ধর্মগুরুদের পরামর্শে জালালুদ্দিন কখনো বলপ্রয়োগের মাধ্যমে হিন্দুদের ধর্মান্তরীকরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ তিনি মনে করতেন এতে হিন্দুদের অসম্মান করা হবে। সুলতানের ঘনিষ্ঠ আহমেদ চাপ তাকে হিন্দুদের মূর্তিপুজো, ধর্মচর্চা ও বিধর্মী কার্যকলাপ বন্ধ করতে পরামর্শ দিলেও জালালুদ্দিন হিন্দুদের প্রাসাদের সামনে মিছিল করা, ঢাক বাজানো বা যমুনা নদীতে মূর্তি বিসর্জনের অধিকার নিষিদ্ধ করেননি। ইসলামীয় ধর্মচর্চার কেন্দ্র দিল্লিতেও হিন্দু প্রজাগণ সসম্মানে বসবাস করতে সমর্থ হয়েছিল। জালালুদ্দিন মনে করতেন হিন্দুদের ভীতি প্রদর্শন করলে সরকারের খ্যাতি সীমিত হয়ে পড়বে এবং জনগণের হৃদয়ে তা স্থায়িত্ব লাভে ব্যর্থ হবে। তাঁর মতে, 'বলপ্রয়োগ করে হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরকরণ অনেকটা জবরদস্তি করে ময়দা ঠাসার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে।'

জালালুদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দিন খলজি (১২৯৬-১৩১৬) খুল্লতাতকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আলাউদ্দিন তাঁর পূর্বসূরির মতো উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেননি। এতদসত্ত্বেও বলা যায় জালালুদ্দিনের দৃষ্টিভঙ্গির গভীর ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য ছিল বলে তাঁর উত্তরসূরিগণ বিভিন্ন রূপে সুলতানের নীতি অনুসরণ করেছিল।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে জালালুদ্দিনের শাসনকালের তাৎপর্য অনেকেই উপেক্ষা করেছেন।

আলাউদ্দিন খলজি মনে করতেন তাঁর পূর্বসূরির জনকল্যাণমূলক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি তৎকালীন সময়ের পক্ষে অনুপযুক্ত ছিল এবং তা সরকারকে দুর্বল করেছিল। আলাউদ্দিন বলবনের ভীতি প্রদর্শনের নীতি প্রয়োগ করে অভিজাত ও সাধারণ জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বের সূচনাকালে ভ্রাতুষ্পুত্র আকত ও অন্যান্য কয়েকজন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল বলে সুলতান কঠোর মনোভাব নিয়ে অভিজাতবর্গকে নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বলবনের মতো আলাউদ্দিনও গুপ্তচর নিয়োগ করে অভিজাতদের গোপনীয়তা সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করতেন। আমিরগণ একে অপরের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেতেন না, বা কোনো অনুষ্ঠানে একত্রে জমায়েত হওয়ার অনুমতী মিলত না। এমনকি পরস্পরের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করার ক্ষেত্রেও সুলতানের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল।

আলাউদ্দিন বলবনের পুরাতন ভীতি-প্রদর্শনের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনেন যাতে জনগণ খুব বেশি বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করার মানসিকতা পোষণ করতে না পারে। এই নীতি সুদৃঢ় করতে ওয়াকফ বা ইনাম হিসেবে দান করা জমি তিনি অধিগ্রহণ করেছিলেন। জালালুদ্দিনের রাজত্বকালের যেসব অভিজাতকে আলাউদ্দিন পদ ও স্বর্ণের জন্য

Scanned with CamScanner

প্রলোভিত করে নিজ পক্ষে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাদের বিতাড়িত করেন।

খলজি সাম্রাজ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ হয়ে যায় এবং এই নীতি অমান্য করলে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হত। এতদসত্ত্বেও আলাউদ্দিন প্রধান কাজির নিকটে নালিশ করেছিলেন যে মদ্য ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করা সম্ভবপর হচ্ছে না।

বারানি উল্লেখ করেছেন যে হিন্দু প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহের মানসিকতা দমন করতে আলাউদ্দিন খলজি কৃষিনীতিতে পরিবর্তন সাধন করেন। পৃথকভাবে এ-বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। সুলতান এক সমালোচনামূলক নীতি গ্রহণ করেন। মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যবাহিনীকে গুজরাটে বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হলে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে চার পঞ্চমাংশ ক্ষতি গ্রহণ করার নীতির বিরোধিতা করে তারাও বিদ্রোহে শামিল হয়। সুলতান দিল্লিতে তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের বন্দি করেন। বারানি এই নীতির প্রশংসা করেছেন। আলাউদ্দিনের ভ্রাতা নুসরত খান আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বিদ্রোহীদের স্ত্রী ও সন্তানদের কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।

ভারতবর্ষকে একটি প্রকৃত ইসলামীয় রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করতে কোনো নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করলে চলবে না। জালালুদ্দিনের মতো আলাউদ্দিন খলজিও তা অনুভব করেছিলেন। বারানির রচনা অনুযায়ী দিল্লির কাজি মুঘিসের সঙ্গে আলোচনার পর আলাউদ্দিন শরিয়ত অনুযায়ী পুরস্কার বা শাস্তি অনুমোদন করেননি। সুলতান বলেছিলেন, 'শরিয়ত অনুসারে কোনটি আইন সম্মত বা কোনটি আইন বিরুদ্ধ তা আমি জানি না। দেশের পক্ষে যা মঙ্গলজনক সেই আদেশ আমি জারি করব।' অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বারানি লিখেছেন যে আলাউদ্দিনের নিকট যে বিষয় বিচারের জন্য নিয়ে আসা হত তিনি ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে বিষয়টি পর্যালোচনা করতেন। এক্ষেত্রে সুলতানদের পূর্বসূরিগণ কাজি ও মুফতিদের (ধর্মীয় বিচারক) পরামর্শ মেনে চলতেন।

আলাউদ্দিন খলজির রাজত্বকালে আতুর্কি প্রজাদের মান উন্নত বা অবনত হয়নি। এই কারণেই সুলতান আতুর্কি বংশজাত জাফর খান ও নুসরত খানকে উচ্চপদে নিয়োগ করেছিলেন এবং মালিক কাফুরকে গুজরাট অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন। সামানা ও সুনামের হিন্দু শাসকদের এক বিশাল সৈন্যবাহিনীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের অধীনে বহু মুসলমান সেনা আধিকারিক ছিল। এই সময় ভারতীয় মুসলমানদেরও সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ করা হয়েছিল। বিশাল সৈন্যবাহিনীর অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও সামানা ও সুনামের শাসকগণ মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়।

(খ) আলাউদ্দিনের কৃষি ও বাজার সংস্কার

সুলতানির অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন ও বারংবার মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করতে এবং বৃহৎ স্থায়ী সৈন্যবাহিনী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, আলাউদ্দিন কৃষি ও বাজার সংস্কারে মনোনিবেশ করেন।

আলাউদ্দিনের কৃষি-সংস্কারের ফলে দিপালপুর ও লাহোর থেকে বর্তমান এলাহাবাদের

নিকটে কারা অঞ্চল পর্যন্ত সমস্ত গ্রাম সরকারের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই অঞ্চলে অভিজাতবর্গকে 'ইকতা' প্রদানের পরিবর্তে সমগ্র গ্রামকে খালিসা বা সরকারের খাস জমিতে রূপান্তরিত করা হয়। দাহনা ভূমি অধিগ্রহণ করে খালিসার অধীনে নিয়ে আসা হয়। এই খালিসার মোট উৎপাদনের অর্ধাংশ সরকারকে ভূমি-রাজস্ব (খরাজ) হিসেবে দিতে হত। কোন ভূমি থেকে কত পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা হবে তা পরিমাপণ পদ্ধতির মাধ্যমে নিরূপণ করা হত। বারানির লেখনী থেকে পরিমাপণ পদ্ধতি ও নির্ণায়ক সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। পরিমাপণ ও সম্ভাব্য উৎপাদন ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে চাষযোগ্য জমির উৎপাদনের কুড়ি ভাগের এক ভাগ রাষ্ট্রকে কর হিসেবে প্রদান করতে হত। 'ঘরি' বা গৃহ কর এবং 'চরাই' বা পশুপালন কর ছাড়া অন্য কোনো অতিরিক্ত কর আদায় করা যেত না। উপরোক্ত করগুলো বহুকাল যাবৎ প্রচলিত ছিল। ভূমি রাজস্ব বস্তুগতভাবে হিসেব করা হলেও তা নগদ অর্থে প্রদান করতে হত। এই কারণে কৃষকরা হয় বানজারাদের কাছে, নয়তো বাজারে (মণ্ডি) শস্য বিক্রয় করত।

আমাদের কাছে রাজপুত বা তাঁর পূর্ববর্তী শাসকদের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার বিবরণ নেই বলে, আলাউদ্দিন খলজির আমলে উৎপাদনের অর্ধাংশ রাজস্ব হিসেবে নেওয়া সত্ত্বেও কেন রাজস্বের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল তা জানতে পারি না। ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী পূর্বে উৎপাদনের এক চতুর্থাংশ বা এক ষষ্ঠাংশ কর আদায় করা হত যা প্রাপকালীন সময়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে অর্ধাংশ হয়ে যেত। প্রাচীন ভারতে ভূমিরাজস্ব ব্যতীত অন্য কোনো কর আদায় করা হত কিনা তা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে কিছু জানা যায় না। অভিজাতবর্গ যেমন 'ভাগ', 'ভোগ', কর ইত্যাদি নামক ভূমি-রাজস্ব ও শুল্ক আদায় করত। তুর্কি শাসকগণও এ-সমস্ত কর আদায় করতেন। আলাউদ্দিন খলজি কৃষকদের প্রদেয় এই সমস্ত অর্থ থেকে উপরিউক্ত করগুলো সম্মিলিত ভাবে গ্রহণ করতেন কিনা তা এখনও অজানা।

পরিমাপণ পুরাতন পদ্ধতি হলেও উত্তর ভারতে এর ব্যবহার হ্রাস পেয়েছিল। বলবনের মতো কোনো-কোনো শাসক এর প্রচলন বজায় রেখেছিলেন বলে বারানি একে অপ্রচলিত পদ্ধতি হিসেবে উল্লেখ করেননি। দেশের বৃহদাংশ জুড়ে পরিমাপণ পদ্ধতির রীতিবদ্ধ ব্যবহার আলাউদ্দিনের অন্যতম কৃতিত্ব ছিল। দোয়াব অঞ্চলকে খালিসায় রূপান্তরিত করে এবং কৃষকদের সঙ্গে কেন্দ্রের সরাসরি সংযোগ স্থাপন করে সুলতান কোনো মধ্যস্বত্বভোগীকে নিয়মতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করেননি। বহু যুগ ধরে রাই, রানা, রাওয়াত প্রমুখ মধ্যস্বত্বভোগীরা পর্যায়ক্রমে ক্ষমতা ভোগ দখল করত। এদের প্রধান বলা হত। একজন প্রধান একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভূমি রাজস্ব আদায় করত এবং তাঁর সমর্থকরা এই কার্যে তাকে সহযোগিতা করত। গ্রামাঞ্চলে গ্রাম প্রধানদের চৌধুরী বা মুকাদ্দম বলা হত। দোয়াব অঞ্চলে তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রইস ও রানাদের উৎখাত করা হয় এবং তারা অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হয়। এই পদ্ধতিতে এক নব্য মধ্যস্বত্বভোগী গোষ্ঠীর উদ্ভব হয় যারা পরগনা বা শিক পর্যায়ে কার্য সম্পাদন করত। বারানি যাদের 'খুৎ' বলে উল্লেখ করেছেন। খসরু প্রথমবার তাদের জমিদার বলে চিহ্নিত করেছেন। আলাউদ্দিনের কৃষি সংস্কারের ফলে রইস বা রানাগণ উৎখাত হতে বাধ্য হয়। আমরা জানি যে খ্রিস্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে গ্রাম

Scanned with CamScanner

প্রধানগণ বিপুল পরিমাণ ভূমি-রাজস্ব প্রদান করে নিজ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। এই ধরনের প্রধানদের অধীনস্থ ভূমি খালিসার অধীনে আনা হয়েছিল।

খালিসার অধীনে দোয়াব অঞ্চলকে আনার পর খলজি খুৎ, মুকাদ্দম, চৌধুরীদের ক্ষমতা হ্রাস করেন। বারানি মন্তব্য করেছেন যে এইসব গোষ্ঠী এত অর্থবান ছিল যে আরবি ও ইরাকি অশ্বের ব্যবহার, সূতী বস্ত্র পরিধান ও অনুষ্ঠানে মদ্যপান করার মাধ্যমে গ্রাম্য অভিজাততন্ত্রের জন্ম দিয়েছিল। তারা গ্রামের সর্বোৎকৃষ্ট ভূমির মালিকানা লাভ করতে অর্থ ব্যয় করত। ভূমির রাজস্ব যেহেতু সমগ্র গ্রামের ওপর নির্ধারিত হত তাই দুর্বল প্রধানদের ভূমি-রাজস্ব আদায়ের জন্য সম-পরিমাণ দায়িত্ব বহন করতে হত।

আলাউদ্দিনের কৃষি সংস্কারের নির্দিষ্ট কোনো প্রভাব গ্রামাঞ্চলে পড়েছিল কিনা তা আমরা জানতে পারি না। সুলতান খুৎ, মুকাদ্দম বা চৌধুরীদের কেবলমাত্র চারণ কর বা গৃহ কর প্রদান করতে বাধ্য করেননি, তাদের ওপর নির্ধারিত উচ্চ হারে ভূমি-রাজস্বও তারা অন্যের ওপর চাপাতে পারত না। তারা ভূমি-রাজস্ব আদায় করলেও খুতি কর আরোপ করার অনুমতি পায়নি। বারানি এদের অবস্থা সম্পর্কে অতিরঞ্জিত করে লিখেছেন যে এরা সর্বস্ব হারিয়ে গ্রামের সর্বাধিক নিম্নভৃত্যে (বলাহার) পরিণত হয়। এই মধ্যস্বত্বভোগীরা কেবলমাত্র সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান, অশ্বারোহণ বা পান-ভক্ষণ থেকে বঞ্চিত হয়নি, এদের পরিবারের মহিলারাও মুসলমানদের গৃহে অন্ন সংস্থানের উদ্দেশ্যে দাসী-বৃত্তি অবলম্বন করে। এসব সত্ত্বেও আলাউদ্দিনের পক্ষে ভূমির পুনর্বন্টন করা সম্ভবপর হয়নি। কারণ উপরিউক্ত সুবিধেভোগী গোষ্ঠী সর্বোৎকৃষ্ট জমির মালিকানা ভোগ করে সমাজের সুবিধেভোগী শ্রেণি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তবে বারানির এ-মন্তব্য অনস্বীকার্য যে শাস্তির ভয়ে ভীত হয়ে এই সুবিধেভোগী গোষ্ঠী সুলতানের প্রতি অনুগত ছিল এবং একজন দপ্তরির আদেশে সমাহর্তার দপ্তরে সময়মতো উপস্থিত হয়ে ভূমি-রাজস্ব প্রদান করত।

আলাউদ্দিনের নির্দেশে সুবিধাভোগী শ্রেণিকে দমন করে কতদূর পর্যন্ত কৃষকরা লাভবান হয়েছিল এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এটি মনে হতে পারে যে কৃষকরা এক হস্তে যা লাভ করেছিল অন্য হস্তে তা রাজস্ব হিসেবে প্রদান করতে বাধ্য হয়েছিল। আলাউদ্দিনের বাজার-সংস্কার নীতির ফলে 'কৃষকদের লভ্যাংশ এত কমে গিয়েছিল যে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের (দুধ ও মাখন) প্রবলভাবে অভাব দেখা দিয়েছিল।' আমরা জানতে পেরেছি যে সরকারের অত্যাচারের ভয়ে কৃষকরা ভূমি-রাজস্ব সঠিক সময়ে প্রদান করতে অনেক ক্ষেত্রে নিজের স্ত্রী ও গৃহপালিত পশুকে বেচে দিত।

কৃষি-সংস্কারকে সাফল্য প্রদান করতে রাজস্ব ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সততা ও দক্ষতার ওপর আলাউদ্দিন গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। খলিসা জমি বৃদ্ধি পাওয়ার পর হিসেবরক্ষক (মুতসারিফ) সমাহর্তা (আমিল) ও প্রতিনিধি (গোমস্তা) নিয়োগ করা মোটেই সহজ কাজ ছিল না। কত স্বল্প সময়ের মধ্যে সুলতান এদের নিকটে পৌঁছোতে পারেন তা জানাতে দ্রুত এদের নিয়োগ করা হয়। নায়েব উজির বা সরাফ কাইস গ্রামের পাটোয়ারিদের হিসেবের খাতা পরীক্ষা করত। প্রথমবার শোনা যায় যে এক জিতেলও

হিসেবের গোলমাল থাকলে কর আদায়কারীকে কঠোর সাজা ভোগ করতে হত বা বন্দি করা হত। আলাউদ্দিন তাদের সুষ্ঠু জীবনযাপনের জন্য বড়ো পরিমাণ অর্থ প্রদান করতেন যাতে উৎকোচ আদায় করার প্রয়োজন না পড়ে। যারা উৎকোচ আদায় করত সুলতান তাদের শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। বারানি এদের চরিত্র চিত্রণ করতে গিয়ে বলেছেন একজন আমিল বা মুতসারিফও উৎকোচ নিত না কারণ তাদের কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হত। যাবজ্জীবন কারাবাস বা এত কঠোর শাস্তি হত যে জনগণ তাদের নীচু নজরে দেখত ও তাদের পরিবারের সঙ্গে কেউ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করত না।

আলাউদ্দিন পরিমাপণ পদ্ধতি, সুবিধেভোগী গোষ্ঠীর ক্ষমতা হ্রাস, পাটোয়ারির হিসেবরক্ষণের খাতা বা বহী হিসেবরক্ষকের মাধ্যমে পরীক্ষণ প্রভৃতি নীতি পরবর্তীকালে শের শাহ ও আকবর অনুসরণ করেছিলেন। তবে সুবিধেভোগী শ্রেণির ক্ষমতা হ্রাসের প্রচেষ্টা আংশিক সাফল্য লাভ করেছিল। আলাউদ্দিনের উত্তরসূরি মুবারক শাহের রাজত্বকালে খুৎ, মুকাদ্দম প্রভৃতি সুবিধেভোগী শ্রেণি পুনরায় ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে ও আলাউদ্দিনের পরিমাপণ পদ্ধতিকে অস্বীকার করে।

আলাউদ্দিনের বাজার-নিয়ন্ত্রণ নীতিই ছিল কৃষি-সংস্কারের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও স্থায়ী ফলাফল। বাজার-সংস্কার নীতি, গ্রাম ও শহরের সম্পর্ককে উন্নততর করে সুলতানির অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনে সহায়তা করে।

বাজার সংস্কার

যদিও আলাউদ্দিন খলজি মূলত শাসনতান্ত্রিক ও সামরিক প্রয়োজনে বাজার-সংস্কার নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তা সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনে এর গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

আলাউদ্দিনের বাজার-নিয়ন্ত্রক নীতি তৎকালীন ব্যক্তিদের মধ্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। মধ্যযুগীয় শাসকবর্গ মনে করতেন খাদ্যশস্যের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ন্যায্য মূল্যে শহরের বাজারে সহজলভ্য হওয়া উচিত। ইসলামীয় দুনিয়ায় সভ্যতা মূলত নগরকেন্দ্রিক ছিল ও শাসনকার্য নগর থেকে পরিচালিত হত বলে গ্রামাঞ্চল অনুন্নত সংকীর্ণ পরিসরে সীমাবদ্ধ ছিল বলে মনে করা হত। বণিকদের সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে কতিপয় শাসক মূল্য-নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্তন করেছিলেন। আলাউদ্দিন খলজিই সর্বপ্রথম শাসক ছিলেন না যিনি মূল্য-নিয়ন্ত্রণ আইন নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রচলন করেছিলেন, তবে বেশ বৃহৎ সময় ধরে এই আইন বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

বারানি লিখেছেন যে আলাউদ্দিন খলজি দিল্লিতে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করতে বৃহৎ সৈন্যবাহিনী পালনের উদ্দেশ্যে বাজার-নিয়ন্ত্রক আইন প্রবর্তন করেন। তৎকালীন রাজকোষে যা ধনসম্পদ ছিল সৈন্যদের বেতন দিতে গেলে তা নিঃশেষিত হয়ে যেত। ফলত সুলতান বাজার-নিয়ন্ত্রক আইন প্রচলন করে দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করেন। একজন অশ্বারোহী সৈন্যকে বাৎসরিক ২৩৮ টাকা ও দুই অশ্বের অধিপতিকে ৭৮ টাকা বেতন

Scanned with CamScanner

দেওয়া হত। বারানি বাজার নিয়ন্ত্রক আইনের অপর একটি কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে আলাউদ্দিন হিন্দুদের বিদ্রোহের সম্ভাবনা দমন করতে তাদের দারিদ্র্য বৃদ্ধি করতে উদ্যোগী হন। আলাউদ্দিনের বাজার-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করা একান্ত আবশ্যক।

বারানির মতে আলাউদ্দিন দিল্লিতে তিনটে বাজার স্থাপন করেছিলেন। প্রথমটি খাদ্যশস্যের, দ্বিতীয়টি সব ধরনের বস্ত্র, শর্করা, ঘি, তৈল, শুষ্ক ফল প্রভৃতি মহার্ঘ দ্রব্যের ও তৃতীয়টি অশ্ব, ক্রীতদাস ও গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের বাজার ছিল। প্রত্যেকটি বাজারের শাসন নিয়ন্ত্রণ করতে বিস্তৃত আইন (জাওয়াবিত) প্রণয়ন করা হয়েছিল।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্তন করে সুলতান খাদ্যদ্রব্য শস্য ব্যবসায়ীদের (কারবানি বা বানজারা) মারফত শহরে আনয়ন ও সঠিকভাবে বন্টনের ওপর কঠোরভাবে নজর দিয়েছিলেন। খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণের তিনটে প্রধান লক্ষ্য ছিল। ব্যবসায়ীরা যাতে লভ্যাংশ বৃদ্ধি করতে অতিরিক্ত খাদ্য মজুত করে কৃত্রিম চাহিদা তৈরি করে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি করতে না পারে সেজন্য আলাউদ্দিন রাজভাণ্ডারে প্রভূত পরিমাণ শস্য মজুত করতে নির্দেশ দেন। এজন্য দিল্লিতে রাজকীয় শস্যাগার নির্মাণ করা হয়। দিল্লির নিকটবর্তী দোয়াব অঞ্চল থেকে রাজার প্রাপ্য শস্যের এক চতুর্থাংশ শস্যাগারে সংরক্ষিত করার জন্য তা নগদের পরিবর্তে শস্য হিসেবে আদায় করা হত। শস্যগুলো প্রথমে স্থানীয় শস্যাগারে ও পরে দিল্লিতে প্রেরণ করা হত।

কারবানি বা বানজারা গোষ্ঠী প্রায় ১০,০০০ থেকে ২০,০০০ বলদের গাড়ি ব্যবহার করে শস্য গ্রাম থেকে শহরাঞ্চলে পরিবহণ করে আনত। বানজারাদের নিগম গঠন করে পরস্পরকে আশ্বস্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তারা যমুনা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে স্ত্রী, সন্তান, পণ্য ও গৃহপালিত পশু সমেত বসবাস করত। একজন আধিকারিক এদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। যাকে সাহানা বলা হত। স্বাভাবিক সময়ে বানজারাগোষ্ঠী এত শস্য দিল্লিতে বহন করে আনত যে তা শস্যাগারে রাখার প্রয়োজন হত না।

বানজারাগণ যাতে নিয়মিত খাদ্য সরবরাহ করে সে জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়। দিল্লির একশত ক্রোশের মধ্যে দোয়াব অঞ্চলে খালিসা ভূমিতে যেখানে উৎপাদনের অর্ধাংশ ভূমি-রাজস্ব হিসেবে গৃহীত হত সেখানে একজন আধিকারিক নিয়োগ করা হয় যাতে কৃষকরা গৃহে নির্মিত সংরক্ষিত গর্তে শস্য জমা না করে সস্তা দরে ব্যবসায়ীদের নিকটে শস্য বিক্রয় করছে কিনা তা নিরূপণ করা যায়।[1] ব্যক্তিগত চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত শস্য ও বীজ কৃষকরা বাজারে বিক্রয় করত। স্থানীয় কর্মচারীদের একটি অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করতে হত যাতে তারা কাউকে অত্যাচার করে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে শস্য ক্রয় করতে না পারে। এই নীতি লঙ্ঘিত হলে খাদ্যশস্য অধিগ্রহণ

১। একটি আইন অনুযায়ী, 'সুলতান নির্দেশ দিয়েছিলেন যে দোয়াব অঞ্চলের খালিসা ভূমির খরাজ দিল্লিতে শস্য হিসেবে নিয়ে যেতে হবে।' উপরিউক্ত আইনের সঙ্গে এর বৈপরীত্য সৃষ্টি হওয়ায় দিল্লি ব্যতীত অন্যান্য শহরে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। বাস্তবে খরাজ কর নগদে ও শস্যে উভয়ভাবেই গ্রহণ করা হত।

করা হত এবং কৃষক ও কর্মচারী উভয়কেই কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হত। বারানি বলেছেন যে একজন কৃষক দশ মণের বেশি শস্য মজুত করতে পারত না। তবে এই আইন প্রণয়ন মোটেই সহজ কাজ ছিল না। সব শস্যই বাজারে এনে সরকারি মূল্যে বিক্রয় করা হত।

আলাউদ্দিন তাঁর প্রবর্তিত মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতির প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। রাজকর্মচারীকে (সাহানা) যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদান করে নিয়োগ করা হয়েছিল। যাতে সে নিয়ম ভঙ্গকারীকে কঠোর শাস্তি প্রদান করতে পারে।

বারানি মন্তব্য করেছেন যে এর ফলে শস্যের মূল্য হ্রাস পায়। গম ৭½ জিতল মণ, বার্লি ৪ জিতল, উচ্চমানের চাল ও ডাল ৫ জিতল দরে বিক্রি হত। আধুনিক ওজনের রীতিতে গমের ৮৮ সের এবং ডাল ও উঁচু মানের চালের ৬৮ সের এক টাকা দরে বিক্রয় করা হত। সমসাময়িক ব্যক্তিদের মতে এই দর অত্যন্ত সস্তা ছিল।[2]

অভাবের সময় আলাউদ্দিন খলজি রেশন ব্যবস্থার প্রচলন করেন। প্রত্যেক বৃদ্ধি সরকারি শস্যাগার থেকে জনসংখ্যা অনুযায়ী শস্য লাভ করত। একসঙ্গে কোনো ব্যক্তি এক মণের বেশি ক্রয় করতে পারত না। অভিজাতবর্গের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য ছিল না। তাদের গ্রাম বা ভূমি না থাকলে অভিজাতদের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তি অনুযায়ী তারা শস্য লাভ করত।

বারানি লিখেছেন যে দুর্ভিক্ষের সময়েও দিল্লিতে খাদ্যাভাব দেখা যায়নি। এমনকি খাদ্যশস্যের মূল্য বা দাম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়নি। বারানির সমসাময়িক ইসামি এই মতকে সমর্থন করে লিখেছেন দিল্লিতে এ-সময় বিরাটসংখ্যক জনসমাগম হলেও দুই-তিনজন দুর্বল ব্যক্তি ছাড়া কেউই মারা যায়নি। দুর্ভিক্ষের পূর্বে আলাউদ্দিন নির্দেশ জারি করে শস্য মজুত করে রেখেছিলেন যাতে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

দ্বিতীয় বাজার অর্থাৎ বস্ত্রাদি, শুষ্ক ফল, তৈজসপত্র, ঘি, তৈল প্রভৃতি যেখানে ক্রয়-বিক্রয় হত তা সরাই-ই-আদল নামে পরিচিত ছিল। আলাউদ্দিন খলজি নির্দেশ দেন যে দেশ-বিদেশ থেকে আনীত বস্ত্র ব্যবসায়ীগণ সরকারি দামে বাজারে ও গুদামে বিক্রয় করতে পারবে। কোনো দ্রব্য যদি সরকারি মূল্যের তুলনায় এক জিতল বেশি দামে বিক্রয় করা হয় তাহলে সেই দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করে সরকার বিক্রেতাকে কঠোর শাস্তি দেবে। সমস্ত দ্রব্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের নাম অন্তর্ভুক্তিকরণের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং একটি চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেক বছর সমপরিমাণ দ্রব্য বাজারে এনে সরকারি মূল্যে বিক্রয় করতে সকল ব্যবসায়ী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকত।

উপরিউক্ত পদ্ধতি নব্য প্রচলিত না হলেও এর দুইটি পদক্ষেপ নব্য চিন্তাধারার স্বাক্ষর বহন করে। প্রথম, ধনী মুলতানি ব্যবসায়ীগণ সুদূর প্রান্ত এমনকি বিদেশ থেকে পণ্য সরবরাহ করত বলে তারা তাদের সংগৃহীত পণ্য সরাই-ই-আদলে সরকারি মূল্যে বিক্রয়

২। আলাউদ্দিন ও আকবরের মণের হিসেব ছিল ২৮ সের-এ এক মণ।

করবে এই শর্তে সরকার তাদের কুড়ি লক্ষ টাকা অগ্রিম দিত। দ্বিতীয়, এই আইন সঠিকভাবে অনুসৃত হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করার দায়িত্ব একদল ব্যবসায়ীর ওপর অর্পণ করা হয়। আমরা অনুমান করতে পারি—যে বিশাল পরিমাণ বস্ত্র দিল্লিতে আনয়ন করা হয়েছিল, তা বহুদিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়েছিল।

অবশেষে যে সমস্ত মহার্ঘ বস্ত্র দিল্লিতে বিক্রয় করা যেত না তা বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের সাহায্যে দিল্লির বাইরে প্রেরণ করা হত। দিল্লির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এইসব বস্ত্র চার বা পাঁচ গুণ মূল্যে বিক্রয় করা হত। এগুলোর বিক্রয় কার্য তদারক করতে একজন আধিকারিককে নিয়োগ করা হত যাতে সে আমির, মালিক প্রভৃতি ব্যক্তিদের আয় অনুযায়ী ওইসব বস্ত্র ক্রয় করতে তাদের অনুমতি দিতে পারে।

বারানি খাদ্যশস্যের এক বিস্তারিত ফর্দ দিয়েছেন যা থেকে আমরা বিভিন্ন পণ্যের মূল্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি। এই ফর্দ দ্রব্যের সস্তা দর সম্বন্ধে আভাস প্রদান করে। একজন ব্যক্তির নিকৃষ্ট মানের বস্ত্র ৪০ ইয়ার্ড, সূক্ষ্মভাবে বোনা বস্ত্র ২০ ইয়ার্ড, নিকৃষ্টমানের শর্করা এক সের ১ ১/২ জিতল, অর্ধ সের ঘি ১ জিতল ও তিন সের তিলের তেল ১ জিতল মূল্যে ক্রয় করতে পারত।[৩]

তৃতীয় বাজারটি অশ্ব, গৃহপালিত পশু ও ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সামরিক বিভাগ ও সৈনাদের জন্যে উচ্চমানের গুণসম্পন্ন উত্তম অশ্ব সরবরাহ আবশ্যক ছিল। অশ্ব ব্যবসায়ে মুলতানি ও আফগানি ব্যবসায়ীদের কম-বেশি আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু দালালদের মাধ্যমে অশ্ব বিক্রয় করা হত। বারানির মতে ধনী দালালরা বাজারে সরকারি কর্মচারীদের মতো ক্ষমতাশালী ও নির্লজ্জ ছিল বলে ক্রয়-বিক্রয়ের সময় উৎকোচ নেওয়া ও অন্যান্য অসদুপায় অবলম্বন করত। অশ্বের মূল্যবৃদ্ধি করতে অশ্ব-ব্যবসায়ীরা দালালদের সঙ্গে যৌথভাবে সংঘ গঠন করেছিল।

দালালদের বিরুদ্ধে আলাউদ্দিন খলজি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কতিপয় দালালকে শহর থেকে বিতাড়ন করা হয় এবং অবশিষ্টাংশকে দুর্গে বন্দি করা হয়। এরপর অন্য দালালদের সহযোগিতায় অশ্বের গুণমান ও মূল্য নির্দিষ্ট করা হয়। প্রথম শ্রেণির অশ্ব ১০০ থেকে ১২০ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণির অশ্ব ৮০ থেকে ৯০ টাকা এবং তৃতীয় শ্রেণির অশ্ব ৬৫ থেকে ৭০ টাকায় বাজারে বিক্রি হত। সাধারণ মানের অশ্ব বা টাট্টু সামরিক বাহিনীতে ব্যবহৃত হত না বলে এর মূল্য ২৫ টাকা ছিল।

আলাউদ্দিন চাইতেন না যে ধনাঢ্য ব্যক্তি ও দালালরা অশ্ব-বাজারে প্রবেশ করুক। তিনি সামরিক বিভাগের (দেওয়ান-ই-আর্জ) জন্য সরাসরি অশ্ব ক্রয় করার পক্ষপাতী ছিলেন। তবে মধ্যস্বত্বভোগী বিতাড়নের ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে সফল হয়নি। বারানি মন্তব্য করেছেন যে আলাউদ্দিন খলজির রাজত্বকালে অশ্বের মূল্য সীমাবদ্ধ ছিল।

সামরিক বিভাগের জন্য প্রয়োজন না হলেও ক্রীতদাস হিসেবে নারী ও পুরুষের মূল্য নির্দিষ্ট ছিল। এর কারণ অবশ্য স্পষ্ট নয়। আপাতভাবে ধনী ও অভিজাত শ্রেণির

৩। আলাউদ্দিনের রৌপ্যমুদ্রায় ২৫০ মিলিগ্রাম বা এক তোলার সমান রৌপ্য ছিল। তাম্র মুদ্রা ছিল ৪০ বা ৫০ জিতল।

জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। সরকারি আধিকারিক, কর্মচারী ও সৈন্যদের ব্যক্তিগত কার্যে এবং গৃহস্থালীর কার্যে সহায়তার জন্য ক্রীতদাসের প্রয়োজন হত। সেইরকম মাংস, পরিবহণ, দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য সহজলভ্য করতে গৃহপালিত পশুর মূল্যও নির্ধারণ করা হয়েছিল।

বারানির মতে আলাউদ্দিনের কঠোর মনোভাবের কারণেই পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হয়েছিল। ব্যবসায়ীরা যাতে ওজনের ক্ষেত্রে প্রতারণা করতে না পারে সেই জন্যে আলাউদ্দিন খলজি ছোটো ছোটো ছেলেদের বাজারে প্রেরণ করতেন। বারানি সুলতানের চরিত্রের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন ওজনে কম হলে বিক্রেতার দেহ থেকে দ্বিগুণ পরিমাণ মাংস কর্তন করা হত। কতিপয় ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল। তবে ব্যবসায়ী ও বৃহৎ-সংখ্যক জনগণের ন্যূনতম সমর্থন ছাড়া এই ব্যবস্থা দীর্ঘদিন যাবৎ পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব ছিল।

এ-কথা সহজেই অনুমেয় যে কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। আমরা দেখেছি যে যেসব ব্যবসায়ীদের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছিল তারা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন। মুলতানি ও দালালদের এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল যে ফলশ্রুতি হিসেবে তারা দৈনন্দিন জীবনযাপনের সঙ্গে নিজেদের মৃত্যু কামনা করত। উচ্চহারে ভূমি-রাজস্ব আদায় ও খাদ্যশস্যের নিম্ন মূল্য হওয়ার ফলে কৃষক সম্প্রদায় সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর বাজার-নিয়ন্ত্রণ নীতি অন্তর্হিত হয়। সুলতানের উত্তরসূরি কুতবউদ্দিন মুবারক শাহ কেবলমাত্র বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দিল্লিতে বন্দি-দশা বা নির্বাসন থেকে মুক্তিই দেননি—তিনি খাদ্য, বস্ত্র, পরিধান, মতপ্রকাশ এবং ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নেন।

বারানি লিখেছেন যে আলাউদ্দিনের বাজার-নিয়ন্ত্রণ নীতি কেবলমাত্র দিল্লিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ তথ্য যদি সত্য হয় তবে সমগ্র দোয়াব অঞ্চল থেকে খাদ্যশস্য সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা ছিল না। দিল্লি ব্যতীত ও লাহোর থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন শহরে সৈন্যেরা তাদের পরিবার-সহ বসবাস করত। বারানি নিজে উল্লেখ করেছেন যে রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে এই সংস্কার প্রথমে রাজধানীতে প্রবর্তিত হলেও তা অন্যান্য শহরেও অনুসরণ করা হয়েছিল। তবে দিল্লির অন্যান্য অঞ্চলে মূল্য নিয়ন্ত্রণের কী প্রভাব পড়েছিল তা আমরা জানতে পারি না।

আপাতভাবে আলাউদ্দিনের এই আইন প্রণয়ন বিরক্তি, আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও নৈতিক অবনতির সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। হয়তো সামরিক বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ওপর মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রচলন করলে সুলতান অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করতেন। কিন্তু তিনি 'টুপি থেকে জুতো, চিরুনি থেকে সূঁচ, সব্জী, মিষ্টি, নোনতা থেকে রুটি প্রভৃতি দ্রব্যের' ওপর মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রচলন করেন। এই ধরনের কেন্দ্রীভূত বিস্তৃত ব্যবস্থা লঙ্ঘিত হতে বাধ্য। অতিরিক্ত শাস্তি প্রদানও অসন্তোষের জন্ম দিয়েছিল।

Scanned with CamScanner

একথা অনস্বীকার্য যে আলাউদ্দিন খলজির বাজার-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ক্ষণস্থায়ী হলেও আপৎকালীন সময়ে বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

(গ) ১৩২৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তার

আমরা দেখতে পেয়েছি যে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি সুলতানি প্রতিষ্ঠার পঁচাশি বছর পরেও সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ ভাঙন প্রতিরোধ করে দিল্লিতে নিজের ক্ষমতা সুদৃঢ় করতে বিভিন্ন শাসকবর্গ মনোযোগী ছিলেন। তুর্কি আমিরবর্গ নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করতে এবং হিন্দু রাজাদের বিতাড়িত করে তাদের রাজ্য অধিকার করতে মনোনিবেশ করেছিল। আধিকারিক, কর্মচারী, শাসনবিভাগ ও সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে ভারতীয় মুসলমান ও হিন্দুদের প্রতি মহৎ উদারতা ও যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে খলজি বংশের সুলতানগণ শাসনতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের পাশাপাশি সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

খলজি সুলতানবর্গের সাম্রাজ্য বিস্তারকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায়ে দিল্লির নিকটবর্তী গুজরাট, রাজস্থান ও মালব অঞ্চল বিজয় করা হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে বর্তমান মহারাষ্ট্র ও দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়ে ওই অঞ্চলকে দিল্লির নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। এই পর্যায়ে সরাসরি সুলতানের অধীনস্থ করার প্রয়াস চালানো হয়। আলাউদ্দিনের রাজত্বকালের শেষ পর্যায়ে তৃতীয় পর্বের সূত্রপাত ঘটেছিল। গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের (১৩২০-২৪) রাজত্বের প্রথম পর্বে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলে এই সাম্রাজ্য বিস্তারের কার্য সম্পন্ন হয়। বাংলাকে সরাসরি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রায় ত্রিশ বছরের মধ্যে দিল্লি সুলতানির আধিপত্য সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হয়েছিল। প্রত্যেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী সুলতানের রাজ্য বিজয়ের পর্যালোচনা করে আমরা এর বিবর্তনের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব।

(১) গুজরাট

গজনির তুর্কি শাসক গুজরাট আক্রমণ করলেও গুজরাটের চালুক্য-বংশীয় শাসক সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে সফল হয়েছিল। পরবর্তীকালে মুঈজুদ্দিন মহম্মদ ঘুরী অহিলওয়াড়া আক্রমণ করে অধিকার করলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তুর্কি শাসকগণ বহুদিন পর্যন্ত গুজরাটকে অবহেলা করেছিলেন। এটি কেবলমাত্র উর্বর ও জনবহুল রাজ্য ছিল না, হস্তশিল্প ও বস্ত্রবয়ন শিল্পে এর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অনস্বীকার্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীন ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে খাম্বাত বা কাম্বে বন্দরের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। দীর্ঘ সময় যাবৎ জৈন ছাড়াও হিন্দু, বোহরা ও আরব্য ব্যবসায়ীরাও বসবাস করত। উন্নতির ফলস্বরূপ শাসকগণ স্বর্ণ ও রৌপ্য সংগ্রহ করতেন এবং বহু সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ করতেন। দিল্লির সুলতানগণ গুজরাটের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন কারণ মোঙ্গলরা মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার ওপর আধিপত্য বিস্তার করলে ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় বলে মধ্য এশিয়া

ও ইরাকের উন্নত মানের অশ্বের সরবরাহ হ্রাস পায়। বলবন ভারতে-জাত অশ্ব দ্বারা সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিলেন। গুজরাটের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারলে আরবি, ইরাকি ও তুর্কি অশ্বের সরবরাহ স্বাভাবিক থাকবে যা সৈন্যবাহিনীর জন্য একান্ত আবশ্যক। দীর্ঘদিন ব্যাপী ইরাক ও ইরানের সঙ্গে বৈদেশিক সম্পর্ক বজায় রাখাও সম্ভবপর হবে।

উপরিউক্ত কারণে কোনো সূচনা ব্যতীত দিল্লির সুলতানগণ গুজরাট অভিযানে উদ্যোগী হন। কিন্তু গুজরাটের শাসকের মুখ্যমন্ত্রী করণ আইনবিরুদ্ধ কার্যে লিপ্ত ছিলেন বলে সেখানকার শাসক তাঁর অবর্তমানে তাঁর স্ত্রীকে বন্দি রেখেছিলেন বলে তিনি আলাউদ্দিন খলজিকে গুজরাট আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন তাঁর প্রধান সেনাপতিদ্বয় উলুঘ খান ও নুসরত খানকে গুজরাট অভিযানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। উলুঘ খান সিন্ধু প্রদেশ অভিযান করে গুজরাট অভিযানের পথে জয়সলমির লুণ্ঠন কার্য সমাধা করেন। রানার প্রতিরোধ সত্ত্বেও যৌথবাহিনী গুজরাটের মধ্যে দিয়ে চিতোরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। অহিলওয়াড়া পৌঁছে তাঁরা শাসককে অপসারণ করে যথেচ্ছ লুণ্ঠন করেন। আশ্চর্য হয়ে রাই করণ দেবগিরিতে পলায়ন করেন। তাঁর সমস্ত সম্পদ, নারী ও সুন্দরী মহিষী কমলা দেবীকে তুর্কিরা নিয়ে যায়। কমলা দেবীকে দিল্লিতে এনে আলাউদ্দিনের হারেমে বন্দি রাখা হয়। পুনর্নির্মিত সোমনাথ মন্দিরসহ সুরাট ও গুজরাটের অন্যান্য অঞ্চল লুণ্ঠন করা হয়। খাম্বাতে হিন্দু ও মুসলমান ব্যবসায়ীদের আঘাত করা হয়নি। পরবর্তীকালে দাক্ষিণাত্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা ক্রীতদাস মালিক কাফুর গুজরাটের মুসলমান ব্যবসায়ীদের থেকে ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অধিকার করে সুলতানকে প্রেরণ করেন।

এখানে তুর্কিদের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি কারণ স্থানীয় শাসকের সন্তানহীন অবস্থায় মৃত্যু ঘটলে করণ সিংহাসন অধিকার করে নব্য বংশের সূত্রপাত ঘটান। তাঁর পাপ-কার্যের জন্য করণ স্থানীয় মানুষের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হন। নিজ রাজ্য থেকে পলায়ন করে দক্ষিণ গুজরাটের বাঘলানা অঞ্চলে তুর্কি আক্রমণের ভীতি দূর করে কিছুকাল শান্তিতে রাজত্ব করেন। গুজরাটের অবশিষ্টাংশ তুর্কিদের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে ও সেখানে তুর্কি শাসক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

(২) রাজস্থান

মঈজুদ্দিন মহম্মদ ঘুরীর রাজত্বকালে আজমেঢ়, নাগাউর ও মান্দোর সুলতানের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও সাম্রাজ্যের পরিধি রাজপুতানায় এর বেশি বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়নি। রাজপুতানার সর্বাধিক শক্তিশালী দুর্গ স্বল্প সময়ের জন্য তুর্কি শাসকের অধীনস্থ হলেও অচিরেই তা স্বাধীনতা লাভ করে। জালালুদ্দিন খলজি রণথাম্বোর বিজয়ে উদ্যোগী হলেও পরাজিত হয়ে দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং রানার শক্তি ও প্রতিরোধ করার ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত হন।

গুজরাট রাজ্যকে নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার পর এই অঞ্চলের সঙ্গে উন্নততর যোগাযোগ-স্থাপন করতে আলাউদ্দিন খলজি রাজস্থান ও মালব অধিকার করতে সচেষ্ট

Scanned with CamScanner

হন। মেবারের শাসক তাঁর সাম্রাজ্যের মধ্যে দিয়ে তুর্কি সৈন্যবাহিনী গুজরাটে প্রবেশ করলে তিনি আপত্তি প্রকাশ করেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে জালোনের শাসক ও তুর্কি সৈন্যদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করেন। গুজরাট থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় নব্য মুসলমান মোঙ্গলরা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের বন্টন-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। বিদ্রোহ দমন করা হলেও দুইজন মোঙ্গল আধিকারিক রণথাম্বোর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পৃথ্বীরাজ চৌহানের বংশধর হাম্বির দেব আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেন এবং শক্তিশালী দুর্গের অধিপতি হিসেবে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন। ১৩০১ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের বিজয়ী সেনাপতি উলুঘ খান ও নুসরত খানকে রণথাম্বোর অভিযানের উদ্দেশ্যে আলাউদ্দিন খলজি প্রেরণ করেন। দুর্গ নিরীক্ষণ করতে নুসরত খান অত্যন্ত নিকটে এগিয়ে গেলে শত্রুপক্ষর হাতে নিহত হন। সুলতানের সৈন্যদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সুযোগে রানা দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে উলুঘ খানকে পরাস্ত করেন। এবং বারো মাইল দূরে ঝৈন অঞ্চলে তাকে পশ্চাদপসারণে বাধ্য করেন। রণথাম্বোরে রাজধানী স্থানান্তরিত করার পূর্বে ঝৈন ছিল রানার রাজধানী।

এই পরিস্থিতিতে আলাউদ্দিন নিজে রণথাম্বোরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত দমন করতে সুলতান উদ্যোগী হন। রণথাম্বোর পৌঁছে তিনি ভীষণ কাছ থেকে দুর্গ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করেন। সুলতানের সৈন্যবাহিনী দুর্গের প্রাচীর ভেদ করতে না পারলেও বহু মাস দুর্গ অবরোধ করে রাখে। ফলত দুর্গে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব দেখা যায়। রাজপুত রমণীগণ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে ভয়ংকর জওহর ব্রত পালন করেন এবং পুরুষরা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধে মোঙ্গলরা রাজপুতদের পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন কবি আমির খসরু আলাউদ্দিনের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলেন বলে তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থে রাজপুত রমণীদের জওহর ব্রত পালনের সুন্দর কাব্যিক বর্ণনা দিয়েছেন।

রণথাম্বোর বিজয়ের পর রাজস্থানের অন্যতম শক্তিশালী দুর্গ চিতোর অভিযানে আলাউদ্দিন খলজি উদ্যোগী হন। বহুকাল যাবৎ গুজরাটের চালুক্য শাসক ও গুহিল শাসকদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের অন্যতম কেন্দ্র ছিল চিতোর দুর্গ। আলাউদ্দিনের আক্রমণকালে গুহিল শাসক রানা রতন সিং চিতোরের সিংহাসনের উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন। আলাউদ্দিনের সঙ্গী আমির খসরু প্রায় ছয় মাস অবস্থানকালে সেখানকার চিত্র তাঁর গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। দীর্ঘ ছয় মাস দুর্গ অবরোধের পর অবশেষে রানা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। তাঁর সঙ্গে সুলতান সদ্ব্যবহার করলেও প্রায় ত্রিশ হাজার কৃষককে বন্দি করে হত্যা করা হয়। খসরু চিতোরের নারীদের জওহর ব্রত পালনের উল্লেখ করেছেন।

খসরুর বিবরণের সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক লেখকদের বিবরণের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। তাঁরা কেউই রানি পদ্মিনীর কাহিনি উল্লেখ না করলেও খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সাহিত্যে পদ্মিনীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। প্রায় একশত বছর পর মালিক মহম্মদ জয়িসীর রচনায় বিভিন্ন কাল্পনিক গল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। বহুল প্রচলিত বলে এখানে গল্পটির উল্লেখের প্রয়োজন নেই। রাজস্থানের একজন বিখ্যাত আধুনিক ঐতিহাসিক গৌরীশঙ্কর ওঝা এই কাহিনিকে কল্পনাপ্রসূত বলে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। সুতরাং পদ্মিনীর কাহিনি সম্পর্কে আলোচনা অনাবশ্যক। তবে এই বিষয়টি উল্লেখযোগ্য যে চিতোর বিজয়ের পর আলাউদ্দিন তাঁর পুত্র খিজির খানকে সেখানকার শাসক মনোনীত করেছিলেন।

চিতোর বিজয়ের ফলে রাজস্থানের মেবার ও হারাউতির (বুঁদি) শাসকগণ আত্মসমর্পণ করেন। মেবারের মাদোর পূর্বেই তুর্কিদের অধীনস্থ হয়েছিল। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে গুজরাট অভিযানের সময় জয়সলমীর আত্মসমর্পণ করেছিল। গুজরাট-সংলগ্ন সিওয়ানা ও জালোর দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুললেও ১৩০৪ এবং ১৩১১ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রায় দশ বছরের মধ্যে সমগ্র রাজস্থান তুর্কি শাসকদের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। আজমেঢ় ও রণথাম্বোর এবং চিতোরের মতো শক্তিশালী দুর্গের ওপর সরাসরি আধিপত্য বজায় রাখা আলাউদ্দিনের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। এমনকি তিনি রাজপুত রাজাদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। ঐতিহ্য অনুযায়ী জালোরের রাজার ভ্রাতা মালদেব আলাউদ্দিনকে ৫০০০ অশ্বপ্রদান করলে সুলতান সন্তুষ্ট হয়ে ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে তাকে চিতোরের শাসক হিসেবে খিজির খানের স্থলাভিষিক্ত করেন।

রাজপুতদের অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকা এবং তাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি আলাউদ্দিন খলজি দেবগিরি ও দাক্ষিণাত্যের ক্ষেত্রেও অনুসরণ করেছিলেন।

আলাউদ্দিন খলজিই সুলতানি যুগের প্রথম শাসক ছিলেন যিনি পারস্পরিক আগ্রহের ওপর ভিত্তি করে রাজপুতদের সঙ্গে সুষ্ঠু সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।

(৩) মালব

চিতোর বিজয়ের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে আলাউদ্দিন মালব বিজয়ে অগ্রসর হন, কারণ মালব সম্পদশালী ও জনবহুল রাজ্য হিসেবে পরিচিত ছিল। আমির খসরু লিখেছেন যে মালবের বিশাল আকৃতি ছিল বলে কোনো জ্ঞানী ভৌগোলিকও এর সীমানা সম্পর্কে ধারণা দিতে পারতেন না। পূর্বে ইলতুতমিস ও পরবর্তীকালে জালালুদ্দিনের আমলে আলাউদ্দিন খলজি মালব আক্রমণ করে এর বিশাল ধনসম্পদ লুণ্ঠন করলেও কখনো একে সরাসরি নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেননি। গুজরাট বিজয়ের পর আলাউদ্দিন খলজি দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তারে উদ্যোগী হলে দাক্ষিণাত্যের পথ সুগম করতে মালব বিজয় অনিবার্য হয়ে পড়ে।

১৩০৫ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মালব অভিযানের ক্ষেত্রে আইনুল মুলককে সেনাপতি মনোনীত করেন। মালবের রাই-এর প্রায় ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য থাকলেও তুর্কি শক্তির নিকটে তা ছিল নগণ্য। উজ্জয়িনী থেকে পলায়ন করে রাই মাণ্ডুতে আশ্রয় নিলেও তিনি পরাজিত ও নিহত হন। সমগ্র রাজস্থান বিজয় করতে ব্যর্থ হলেও আলাউদ্দিন সমগ্র

Scanned with CamScanner

মালবকে নিজ অধিকারে নিয়ে আসেন এবং আইনুল মুলককে মালবের শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করেন।'

গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের (১৩২০-২৪) রাজত্বকাল পর্যন্ত বাংলা স্বাধীন থাকলেও সুলতানদের উদ্যোগে তা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের সময়কালে সৈন্যবাহিনী ওড়িশা আক্রমণ করলেও সরাসরি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়নি, বরং সাম্রাজ্যের অধীনস্থ রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল।

(৪) মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারত : প্রথম পর্যায়

অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন, সৈন্যবাহিনী পুনর্নির্মাণ ও মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার পর আলাউদ্দিন খলজি দক্ষিণ ভারতকে সুলতানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তিকরণের দীর্ঘদিনের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার দিকে মনোযোগী হন। মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারত উভয়েই স্বর্ণভাণ্ডার হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তাদের হস্তশিল্পের প্রসার ও উন্নতমানের বস্ত্র স্বর্ণ উত্তোলনে বিশেষ সহযোগী হয়ে উঠেছিল, যার সুফল ওই অঞ্চলের শাসকগণ বংশ-পরম্পরায় ভোগ করছিলেন। দাক্ষিণাত্যে বহু সম্পদশালী মন্দির ছিল যেখান থেকে অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় বাণিজ্য ছাড়াও কন্যাদানের ব্যবসা চালানো হত। এই কারণেই ওই অঞ্চলের অর্থ ও মাহাত্ম্য দুই-ই বৃদ্ধি পেয়েছিল। এরা সর্বদা পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকত। দক্ষিণ ভারতের এই উন্নয়ন উত্তর ভারতের রাজ্যগুলোর পক্ষে বিপদের সংকেত বহন করে এনেছিল।

মহারাষ্ট্র

১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে কারা ও বুন্দেলখণ্ড রাজ্য বিজয়ের পর আলাউদ্দিন খলজি মহারাষ্ট্র অভিযানে আগ্রহী হন। প্রায় ৮,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য সমেত দেবগিরি আক্রমণ করলে সেখানকার যাদব বংশীয় রাজা রামচন্দ্র ও তাঁর পুত্র সিংঘন পরাজিত হয়। সুলতান অজস্র ধনসম্পদসহ দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং রামচন্দ্র সুলতানকে বাৎসরিক উপঢৌকন প্রেরণের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেন।

চিতোর ও মালব বিজয়ের পর আলাউদ্দিন পুনরায় দেবগিরিতে দৃষ্টিপাত করেন। সেই যুগে আক্রমণ করতে কোনো কারণের প্রয়োজন হত না। এ সত্ত্বেও সুলতান আক্রমণের একটি কারণ নির্ধারণ করেন যে রাজা রামচন্দ্র বিগত দুই-তিন বছরে সুলতানকে কোনো উপঢৌকন প্রেরণ করেননি। অনেকে মনে করেন রামচন্দ্রের পুত্র সিংঘম এর জন্য দায়ি ছিল কারণ সুলতানের প্রতি রাজার আনুগত্য তার অত্যন্ত অপছন্দ ছিল।

১৩০৮ খ্রিস্টাব্দে দুজন সৈন্য দেবগিরিতে প্রেরণ করে দক্ষিণ গুজরাটের বাঘলানার শাসক করণকে বিতাড়িত করা হয়। কারণ করণ রামচন্দ্রের সাহায্য নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করছিল। কঠিন যুদ্ধে রাজা পরাস্ত হন। রামচন্দ্রকে শাস্তি প্রদান করতে মালিক কাফুরের বাহিনীতে সৈন্যেরা যোগদান করে। সামান্য প্রতিরোধের পর যাদব-বংশীয় রাজা

কাফুরের অধীনতা স্বীকার করে নেন। আমির খসরুর লেখা থেকে জানা যায় আলাউদ্দিন রামচন্দ্র ও তাঁর পরিবারকে আঘাত করতে কাফুরকে নিষেধ করেছিলেন। এরপর যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে রামচন্দ্র বা রামদেবকে দিল্লিতে নিয়ে আসা হয়। দেবগিরির শাসনভার সিংঘমের হস্তে অর্পণ করা হয়। রামদেব আলাউদ্দিনের রাজসভায় প্রবেশ করলে তাকে অতিথি হিসেবে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে সুলতান তাকে মহার্ঘ ধনরত্ন উপহার দিয়েছিলেন। অতিথি হিসেবে রামদেব ছয়মাস দিল্লিতে অবস্থান করেছিলেন। খসরুর মতে, 'প্রাত্যহিকী তাঁর পদমর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি পেত।' তিনি তাঁর পুত্রের সঙ্গে দেবগিরিতে প্রবেশ করেন। প্রত্যাবর্তনকালে রাম রাই রায়ান উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন এবং স্বর্ণ ছত্রী ও এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা লাভ করেন। গুজরাটের নৌসারী জেলা তিনি উপহার হিসেবে লাভ করেছিলেন। মনে করা হয় রামচন্দ্র তাঁর কন্যা জাট্যপালীকে আলাউদ্দিনের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। এর পূর্বে কমলা দেবীর কন্যা দেবল দেবী তাঁর সৌন্দর্যের জন্য হারেমে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিলেন। করণের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় দেবল দেবীকে বন্দি করে আনা হয়েছিল। দেবল দেবী আলাউদ্দিনের পুত্র ও সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী খিজির খানের সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। যদিও খিজির খানের অত্যন্ত দুঃখজনক পরিণতি হয়েছিল তা সত্ত্বেও বলা যায়, আলাউদ্দিনের ধীরে ধীরে সাম্রাজ্য বিস্তার নীতিতে রাজপুত রাজাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

দক্ষিণ-ভারতীয় রাজ্য

মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যগুলো হল কাকাতীয় বংশের ওয়ারঙ্গল (বর্তমান তেলেঙ্গানা) এবং হোয়শালাদের রাজধানী দ্বার সমুদ্র (বর্তমান কর্ণাটকের হেলেবিড)। সুদূর দক্ষিণে পাণ্ড্যদের মবর এবং মাদুরাই (বর্তমান তামিলনাড়ু) যথেষ্ট শক্তিশালী রাজ্য হিসেবে পরিগণিত হত। সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বে এরা প্রত্যেকেই দেবগিরির রাজার সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিলেন।

১৩০৯ থেকে ১৩১১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দেবগিরির সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপিত হলে আলাউদ্দিন খলজি দাক্ষিণাত্য বিজয় করে সেখানকার রাজ্যগুলোকে সুলতানের অধীনস্থ করে তাদের সম্পদ আহরণ ও বাৎসরিক উপঢৌকন প্রেরণে সম্মতি আদায় করার উদ্দেশ্যে তাঁর প্রধান সেনাপতি মালিক কাফুরকে প্রেরণ করেন। তবে সুলতান দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলিকে সরাসরি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চাননি, কারণ উত্তর ভারতের সঙ্গে দূরত্বের কারণে তাদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হয়ে উঠত না। বারানির সমসাময়িক ইসামির মতে আলাউদ্দিন প্রথমে ওয়ারঙ্গল অভিযান করতে কাফুরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। 'তৈলঙ্গ সম্রাট যদি সুলতানের প্রতি অনুগত হয় তবে তাঁর রাজত্ব তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং তাকে সোনার ছত্রী ও সাম্মানিক উত্তরীয় প্রদান করা হবে।' বারানি লিখেছেন, 'যদি রাই সুলতানকে সম্পদ, হস্তী ও অশ্ব প্রদান করে এবং বাৎসরিক উপঢৌকন দিতে সম্মত হয় তবে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করা হবে।' একই নির্দেশনামা দ্বার-সমুদ্র ও মবর অভিযানের সময়েও জারি করা হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

তেলেঙ্গানার ওয়ারঙ্গলের প্রথম অভিযান ছয় মাস ব্যাপী বিস্তৃত ছিল। দূরবর্তী ও কম ব্যবহৃত পথ দিয়ে কাফুর ওয়ারঙ্গলের দুর্গে প্রবেশ করে। দুর্গের বর্হিদেশে ইস্পাতের চেয়ে শক্ত মাটির দেওয়াল ছিল এবং অন্তর্দেশ প্রস্তর নির্মিত ছিল। সামান্য অবরোধের পর বর্হিদেশ ধ্বংস করে সুলতানের সৈন্যবাহিনী অভ্যন্তরে প্রবেশের পূর্বে রাই শান্তি বজায় রাখতে আনুগত্য প্রদর্শনে সম্মত হয়। আলাউদ্দিনের সামনে কুচকাওয়াজ করে প্রায় সহস্র উষ্ট্র ওয়ারঙ্গল থেকে সম্পদসহ দিল্লিতে বহন করে নিয়ে এসেছিল। রাই দিল্লির সুলতানকে বাৎসরিক উপঢৌকন দিতে সম্মত হয়েছিলেন।

এই সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে পরবর্তী বছর মালিক কাফুরকে সুলতান দ্বার-সমুদ্র অভিযানে প্রেরণ করেন। মারাঠা সর্দার রামদেবের পরিচালনায় দূরবর্তী পথ ব্যবহার করে সুলতানের সৈন্যবাহিনী দ্বার-সমুদ্রে পৌঁছোলে হোয়শালা শাসক বল্লাল দেব আশ্চর্য হয়ে যান। স্বল্প অবরোধের পর বল্লাল দেব ওয়ারঙ্গলের মতো আলাউদ্দিনের আধিপত্য স্বীকার করে নেন। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ সুলতানের নিকট সমর্পণ করেন এবং বাৎসরিক উপঢৌকন প্রেরণ করতে সম্মত হন। ইসামির মতে বল্লাল দেব দিল্লিতে আলাউদ্দিনের জন্য অপেক্ষা করলে তাকে দশ লক্ষ মুদ্রা, স্বর্ণ ছত্রী ও সাম্মানিক উত্তরীয় প্রদান করা হয়। আলাউদ্দিন খলজি বল্লাল দেবকে তাঁর রাজ্য সসম্মানে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

কাফুর মবরের (করমণ্ডল) উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু পাণ্ড্য-বংশীয় ভ্রাতৃদ্বয় একে-অপরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল বলে রাজ্যটি বিজয় করা মোটেই সহজ কার্য ছিল না। কাফুর পাটানে (মাসুলিপট্টনম) পৌঁছে সেখানে মুসলমান ব্যবসায়ীদের সম্মিলিত করে উপনিবেশ গড়ে তোলেন। শহরটি লুণ্ঠন করা হলেও মুসলমান ব্যবসায়ীসহ অন্যান্যদের ক্ষতিসাধন করা হয়নি। কাফুর মাদ্রাজের নিকটে চিদাম্বরম মন্দির লুণ্ঠন করে পাণ্ড্য- ভ্রাতৃদ্বয়ের অসংখ্য হস্তী কুক্ষিগত করেন। তিনি মাদুরাই আক্রমণ করলেও পাণ্ড্য- ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে কোনো সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করতে অসমর্থ হয়ে দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই অভিযান মাত্র একবছর স্থায়ী হয়েছিল।

উপরিউক্ত অভিযান-সমগ্র কেবলমাত্র আলাউদ্দিনের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করেনি, তাঁর মর্যাদাও বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। মালিক কাফুর তাঁর দক্ষতার জন্য সুলতানের প্রিয়-পাত্র প্রতিপন্ন হয়েছিলেন এবং সামরিক বাহিনীতে সর্বোচ্চ পদ লাভ করেছিলেন। তাঁর প্রতিপত্তি এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে সুলতান তাকে মালিক নায়েব (সার্বভৌম ব্যক্তিগত প্রতিনিধি) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। কিন্তু কাফুর ক্ষমতায়নের দিকে প্রলুব্ধ হয়ে নিজ অনুগামী তৈরিতে মনোনিবেশ করেন। ফলস্বরূপ অচিরে কাফুরের ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং অবশেষে তিনি মারা যান।

দাক্ষিণাত্য অভিযানের তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক সুবিধে ছিল অত্যন্ত সীমিত। রামচন্দ্র বা রামদেবের জীবনকালে দেবগিরির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকলেও অন্যান্য রাজ্যগুলোর সঙ্গে তিক্ত সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটে। সামরিক অভিযানের অবিরত চাপ না থাকলে রাজ্যগুলো বাৎসরিক উপঢৌকন প্রেরণ করত না। রাজনৈতিক স্থায়িত্ব বজায় রাখতে বড়ো

ধরনের সামরিক অভিযান পুনরায় প্রেরণ করা সম্ভবপর হয়নি। দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজ্য বিজয়ের উদ্দেশ্যে সামরিক অভিযান প্রেরণ করার সূত্রপাত ঘটে।

মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণী রাজ্যসমূহ—দ্বিতীয় পর্যায় : রাজ্য বিজয়

যদিও আলাউদ্দিন খলজি মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণী রাজ্যসমূহকে বিজয়ের পরিবর্তে নিয়ন্ত্রণে রাখার নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা সত্ত্বেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সুলতান রাজ্য বিজয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৩১৫ খ্রিস্টাব্দে দেবগিরির রামদেবের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র ভিল্লাম আলাউদ্দিনের প্রতি আনুগত্য প্রদান করতে অস্বীকার করেন। তাকে শাস্তি প্রদান করতে আলাউদ্দিন মালিক কাফুরকে দেবগিরি অভিযানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। ভিল্লাম পলায়ন করলে কাফুর দেবগিরের মারাঠা সর্দারকে অপসারণ না করে সেখানকার শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কাফুর এক্ষেত্রে আংশিক সাফল্য লাভ করেন। কারণ দেবগিরির অধিকাংশ সর্দার নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং সাম্রাজ্যের বৃহৎ অংশে পুরাতন বংশগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিল।

রাজ্য বিজয়ের যে নীতি আলাউদ্দিন গ্রহণ করেছিলেন তাঁর বিশ্লেষণ করা একান্ত আবশ্যক। ভিল্লামের বিদ্রোহ সুলতানের অনাক্রম্যতার নীতি থেকে সরে এসে রাজ্য বিজয়ের নীতি অবলম্বন করার একমাত্র কারণ ছিল না। আপাতভাবে আলাউদ্দিন মনে করেছিলেন দেবগিরি তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যসমূহের ওপর সামরিক চাপ সৃষ্টি করে তাদের আনুগত্য আদায় করা সহজসাধ্য হবে। তবে এই চিন্তাভাবনা ছিল নীতির সামান্য পরিমার্জন। কারণ সমগ্র দক্ষিণ ভারতকে সুলতান কখনোই সরাসরি দিল্লির সুলতানি সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে আনার পক্ষপাতী ছিলেন না।

মুবারক খলজি আলাউদ্দিনের স্থলাভিষিক্ত হলে দেবগিরিকে সম্পূর্ণরূপে নিজ নিয়ন্ত্রণে আনতে উদ্যোগী হন। কোনো প্রতিবন্ধকতা ব্যতীত মুবারক খলজি-এ-কার্যে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেন। ওয়ারঙ্গলের রাই বহু বছর যাবৎ বাৎসরিক উপঢৌকন প্রেরণ বন্ধ করেছিলেন বলে মুবারক খলজি রাই-এর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। পূর্বের মতো দুর্গ অবরোধ করা হলে রাই দুর্গের বাইরে বেরিয়ে এসে আত্মসমর্পণ করেন। সুলতান পাঁচটি জেলা বা শিক, প্রভূত সম্পদ ও হস্তী দাবি করেন। অবশেষে রাই সুলতানের সঙ্গে চুক্তি করে একটি জেলা ও বাৎসরিক চল্লিশটি স্বর্ণ খণ্ড প্রদান করতে সম্মত হন। এক্ষেত্রেও মুবারক খলজি অনাক্রম্যতার নীতি অনুসরণ করেছিলেন।

আলাউদ্দিনের মস্তিষ্কপ্রসূত অনাক্রম্যতার নীতি পরবর্তীকালে গিয়াসুদ্দিন তুঘলক ও তাঁর উত্তরাধিকারী পুত্র মহম্মদ বিন তুঘলকের দ্বারাও অনুসৃত হয়েছিল। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে গিয়াসুদ্দিন তুঘলক তাঁর পুত্র উলুঘ খান ওরফে মহম্মদ বিন তুঘলককে ওয়ারঙ্গল অভিযানের নির্দেশ দেন কারণ দিল্লিতে ক্ষমতার পরিবর্তনের সুযোগে সেখানকার শাসক উপঢৌকন প্রেরণ বন্ধ করে দিয়েছিল। দিল্লি থেকে রওনা দিয়ে মহম্মদ বিন তুঘলকের

Scanned with CamScanner

সৈন্যবাহিনী ওয়ারঙ্গলের পথে দেবগিরিতে বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় যাত্রার সূচনা করে। ছয় মাস দুর্গ অবরোধ করার পর উলুঘ খানের শিবিরে দিল্লিতে সুলতানের মৃত্যু হওয়ার গুজব রটেছিল। এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুযোগে কতিপয় অভিজাতকে ওয়ারঙ্গলের রাই উলুঘ খানের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রেরণ করে উলুঘ খানকে দেবগিরি পর্যন্ত সসৈন্যে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করেন।

সুলতানের মৃত্যুর গুজব ভুল প্রমাণিত হলে উলুঘ খান নবগঠিত সৈন্যবাহিনী সহ পরের বছর পুনরায় ওয়ারঙ্গল অভিযানে অগ্রসর হন। এই সময় সেখানকার রাইকে কোনো সুযোগ না দিয়ে তাকে আত্মসমর্পণে উলুঘ খান বাধ্য করেন। ওয়ারঙ্গলের রাইকে এরপর দিল্লি প্রেরণ করা হলে পথে রাই আত্মহত্যা করেন। কালক্রমে সমগ্র তেলেঙ্গানা বিজয় সম্ভবপর হয়। রাজ্যকে নয়টি জেলায় বিভক্ত করে প্রত্যেক জেলায় একজন করে শাসক নিযুক্ত করা হয়। এরা প্রত্যেক বছর সুলতানকে ভূমি-রাজস্ব প্রদান করত।

তেলেঙ্গানা বিজয়ের পর মবর অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়। ১৩২৩ খ্রিস্টাব্দে মবরের রাজধানী মাদুরাই বিজয় সম্ভবপর হয়। মালিক কাফুর পূর্বেই একদল মুসলিম সৈন্য মাদুরাইতে মোতায়েন করে এসেছিলেন। এই বিজয়ের ফলে তার কার্যকারিতা অনুভব করা যায়। মুবারক খলজির একজন সেনা আধিকারিক খসরু খান এই অঞ্চল আক্রমণ করেন। এই সময় তামিল রাজ্য নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের রাজত্বকালে মাদুরাইতে একজন মুসলমান শাসককে কার্যভার অর্পণ করা হয় এবং এইভাবে সমগ্র মবর প্রদেশ দিল্লির অধীনস্থ হয়ে পড়ে।

অবশেষে ১৩২৮ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ বিন তুঘলকের তুতো ভ্রাতা গুরসপ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দক্ষিণ কর্ণাটিকের কাম্বিলে সে আশ্রয় গ্রহণ করলেও সুলতান অচিরেই দক্ষিণ কর্ণাটক বিজয়ে সাফল্য অর্জন করেন।

এইভাবে মাত্র বারো বছরের মধ্যে মালাবারসহ সমগ্র দক্ষিণ ভারত দিল্লি সুলতানির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। দ্বার-সমুদ্রের মতো সামান্য কিছু অঞ্চল পুরাতন শাসকের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হত। এই দ্রুত সাফল্য অচিরেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বিভিন্ন ধরনের শাসকের শাসনে নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অবস্থিত এই রাজ্যগুলোর ওপর ক্রমে সুলতানের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়লে এরা কেন্দ্রের বন্ধন মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে।

তবে দিল্লি সুলতানির সাম্রাজ্য বিস্তার যেমন নতুন সুযোগ-সুবিধের জন্ম দিয়েছিল তেমনই নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীও সৃষ্টি করেছিল।

Scanned with CamScanner